পরিতোষ সেনের ছবি

মৃণাল ঘোষ

।। এক।।

পরিতোষ সেনেব ছবি জীবনকে নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ প্রবহমান জীবনই তাঁর সৃষ্টির উৎস। জীবনের বাস্তবই 'রূপ' -এ প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে অবশ্য নতুন প্রত্যয় কিছু নেই। দৃশ্যকলার ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক এই ঘটনা। প্রকৃতির এবং জীবনের বাস্তবতা তো সবই শিল্পের চালক শক্তি। তবু পুরোপুরি বাস্তবতায় সংশ্লিষ্ট থাকা বা নিবিষ্ট থাকা খুব সহজ নয়। খুব স্বাভাবিকও নয়। অন্তত আধুনিকতার বিবর্তনের ইতিহাসে আমরা সে রকমই দেখেছি। প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে এবং স্বাভাবিকতাকে আধুনিকতা এক সময় ভাঙতে শুবু করেছিল। এই ভাঙতে চাওয়ার পিছনে গভীরতর এক উদ্দেশ্য ছিল তার। সেই এই বাস্তবতারই গহন স্বরূপের গভীরে প্রবেশ করতে চাইছিল। এই ভাঙনের পথে দৃশ্যকলা এক সময় নিরবয়বে পৌঁছল। সঙ্গীত যেমন প্রকৃতির সমান্তরাল রূপের এক স্বতন্ত্র জগৎ দৈরি করতে চায়, আধুনিক চিত্রকলাও এক সময় সেই বিমূর্ততাতেই পৌঁছাতে চেয়েছে। বাস্তবতাকে বিশ্লিষ্ট করা বা দ্রবীভূত করা তাই আধুনিকতার এক অন্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল এক সময়। মন্দ্রিয়ন থেকে জ্যাকসন পোলোক পর্যন্ত বিমূর্ততার এই বিবর্তন পরবর্তী কালে আরও অনেক দূর এগিয়েছে।

আবার বিমূর্ততার পথে না গিয়ে, অবযবে বা প্রকৃতির রূপে সংশ্লিষ্ট থেকেই প্রবহমান সাম্প্রতিকের সংঘাতময় বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গেছেন শিল্পী এ রকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যামিনী রায়ের ছবি এর অনন্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে নব্য ভারতীয় ঘরানার অনেক শিল্পীর কাজেও এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই আমরা। পরিতোষ সেন ১৯৪০-এর দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট একজন শিল্পী। এ কথা সুবিদিত, এই চল্লিশের দশকের শিল্পকলা একটা স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসাবে জেগে উঠেছিল সমকালীন সমাজবাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকেই। নব - ভারতীয় ঘরানা স্বদেশ চেতনার অন্বিত আধুনিকতার যে 'রূপ' গড়ে তুলতে চাইছিল, সমকালীন বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে তাকে যথেষ্ট মনে করেননি চল্লিশের শিল্পীরা। এই জন্যই তাঁর এই রূপনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন। গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন নতুন আঙ্গিক যা শুধু অতীত ঐতিহ্যে নিমগ্ন থাকবে না, যা পরম্পরার সঙ্গে আধুনিকতাকে মেলাবে। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের দেশ-কাল অন্বিত কঠিন ও জটিল বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করবে।

এখানে আমরা এ কথাটাই শুধু বুঝতে চাইছি যে দেশ - কালগত বাস্তবতার প্রতিফলন সমান ছিল না। এই প্রজন্মের অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা কালক্রমে 'রূপ' -এর স্বাভাবিকতাকে সম্পূর্ণই পরিহার করেছেন। ভি. এস. গাইতোণ্ডে (জন্ম : ১৯২৪), এস. এইচ. রাজা (১৯২২), রামকুমার (১৯২৪) প্রমুখ শিল্পী পরবর্তী জীবনে বিমূর্ততার দিকে গেছেন। আবার প্রকৃতিতে বা প্রাকৃতিক অবয়বে লগ্ন থেকেও প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে দূরে সরে গেছেন চল্লিশের শিল্পীদের মধ্যে এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়। নীরদ মজুমদার (১৯১৬-৮২) পাশ্চাত্য আধুনিকতার ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর রূপ। কিন্তু বাস্তবতার বদলে এক আধ্যাত্মিকতাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। গোপাল ঘোষ (১৯১৩-৮০) ছিলেন পরিতোষ সেনেরই একজন সতীর্থ। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে একই সময়ে শিখেছেন তাঁরা। দুজনেই চল্লিশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী। কিন্তু গোপাল ঘোষের প্রধান অবদান নিসর্গের ছবিতে। নিসর্গের ভিতর দিয়েই তিনি এক আদর্শায়িত সৌন্দর্যকে খুঁজেছেন। বাস্তব প্রকৃতি তাঁর প্রকাশের ভিত্তি হলেও সেই বাস্তবতাকে তিনি আদর্শায়িত করেছেন।

কাজেই শিল্পের আধুনিকতায় দেশ - কালগত বাস্তবতার বড় ভূমিকা থাকলেও, তা শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা তত্ত্ববিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পরিতোষ সেনের প্রকাশের বাস্তবলগ্নতা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক শিল্পীই তাঁর নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনন্য। নানা উৎস থেকে তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের আলোয় তা এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যে আহৃত উৎসগুলি থেকে তা একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। পরিতোষ সেনের সমসাময়িক বা প্রায় - সমসাময়িক অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাকে ভিত্তি করেই কাজ করে গেছেন, এরকম শিল্পীও আছেন অনেকেই। চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৩-৭৮) বা সোমনাথ হোর (১৯২১) প্রখরভাবে বাস্তবতায় লগ্ন প্রতিবাদী শিল্পী। সামগ্রিক বিশ্বদৃষ্টির দিক থেকে পরিতোষ সেনের সঙ্গে কিছুটা মিলও থাকা সম্ভব তাঁদের ভাবনার। কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিগত অনন্যতার কারণে পরিতোষ সেনের আঙ্গিক তাঁদের থেকেও অনেকটাই আদালাদ। তাহলে সামগ্রিকভাবে ১৯৪০-এর দশকের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পরিতোষ সেনের অবস্থান কোথায়, ভারতের চিত্রকলার আধুনিকতায় তাঁর অবদানই বা কী, সেটাই আমরা অনুধাবনের চেষ্টা করব এই লেখায়।

পরিতোষ সেনের প্রকাশিত বাস্তবতার স্বরূপ কী? তাঁর ভাবনার বাস্তবতাই বা রূপান্তরিত হয়েছে কিভাবে? তাঁর নিজের জীবনের প্রবহমানতার সঙ্গে কি ভাবে মিশেছে আমাদের দেশের বা সারা বিশ্বের বাস্তবতা? কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা, তাঁর চেতনার মধ্যে? সেই প্রতিক্রিয়া থেকে কিভাবে উৎসারিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টি? এই প্রসঙ্গগুলো আমরা ধীরে ধীরে অনুধাবনের চেষ্টা করব এ লেখার পরবর্তী অংশে। এই অনুধাবনের ভিতর থেকে তাঁ ছবির স্বরূপও উন্মীলিত হবে ধীরে ধীরে।

আমরা জানি পরিতোষ সেন শুধু এই সময়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীই নন, অত্যন্ত বিদগ্ধ একজন লেখক তিনি। শিল্পকলা বিষয়ক এবং আত্মস্মৃতি ভিত্তিক আখ্যানমূলক উভয় ধরনের লেখাতেই এক নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি তৈরী করেছেন তিনি। সে লেখা অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। একই সঙ্গে প্রাঞ্জল, যুক্তিভিত্তিক এবং প্রচ্ছন্ন কৌতুকে দীপ্ত। এই লেখারও প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রখর বাস্তবচেতনা এবং বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তি। তাঁর লেখা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে তাঁর সামগ্রিক মনকে বুঝতে । তাঁর ছবিকে বুঝতেও। তাঁর শিল্পপ্রক্রিয়ার অনুধাবনে এটা একটা বিশেষ সুবিধা।

তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালে বর্তমান বাংলাদেশ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায়। যদিও এই তথ্যে সামান্য ভুল আছে। তাঁর সমস্ত জীবনপঞ্জীতে তাঁর জন্মবর্ষ হিসেবে ১৯১৮-ই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বর্তমান লেখকের সঙ্গে এক ব্যক্তিগত

সাক্ষাৎকারে শিল্পী বলেছেন প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালে। তিনি যখন ইন্দোরে শিক্ষকতা করেছেন, তখন তাঁর সুযোগ হয় একজন ব্রিটিশ রাজপুরুষের সহায়তায় পাসপোর্ট করিয়ে নেওয়ার। স্মৃতি থেকে জন্ম তারিখ বলতে গিয়ে তিনি ভুল করে ১৯১৮ বলেন। । সেটাই তখন তাঁর পাসপোর্টে নথিভুক্ত হয়ে যায়। পরে এই তারিখ আর পরিবর্তন করা যায় নি। সে যাই হোক। খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার নয় এটা। তাঁর শৈশব কৈশোর কেটেছে এই পূর্ববঙ্গে। ঢাকা শহরে তাঁদের বাড়ি ছিল 'জিন্দাবাহার লেন' নামে এক রাস্তায়। সেখানকার নানা বৈচিত্র্যের কথা আমরা জেনেছি 'জিন্দাবাহার' নামে তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ থেকে। এছাড়া তাঁদের আর একটি বাড়ি ছিল ঢাকা শহর থেকে কিছু দূরের এক গ্রামে। সেই গ্রামের নাম 'বলতলি'। দুর্গাপূজা বা শারদোৎসবের সময় তাঁরা সেখানে যেতেন। এ ছাড়া অন্যান্য ছুটিতেও কখনও কাটাতেন সেখানে।

'জিন্দাবাহার' বইয়ের 'আমি' নামের রচনায় এই গ্রামের এক দিনের স্মৃতি কথা বলেছেন তিনি। তাঁর বয়স তখন বছর বারো হবে। 'বেলতলি' - তে গেছেন। ডিঙি নৌকায় করে ওখানকার খাল - বিলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সহসা ওখানকার প্রকৃতির সমস্ত রূপমাধুর্য তাঁর সমস্ত চেতনাকে অভিভূত, বিস্ময়াবিষ্ট করল। তাঁর নিজের কথায় 'এ-নিত্যলোক সত্যিই কী রহস্যময়! কী মধুর! কী মুক্ত জীবন!' সারা দুপুর নৌকায় ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গলুইয়ে মাথা দিয়ে শুয়েছেন। উপরে তাকিয়ে তীরে দেখছেন সবুজ প্রকৃতির অসামান্য রূপ। আর এক দিকে মাটিতে গাছের উপরে জীবনের বিপুল সমারোহ। কেঁচো, ক্যাড়া, শ্যামাপোকা, শুঁয়োপোকা, গুঁই সাপের বাচ্চা, আরও কত কী। আবার নীচের দিকে জলের ভিতর তাকিয়ে দেখছেন শত - শত জীবানু, জলচর পোকা, মৌরলা, ট্যাংরা, পুঁটি, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ ও বিচিত্র সব প্রাণীর সমারোহ। সৃষ্টির এই 'জটিল নক্সা' তাঁকে অভিভূত করেছিল তখন, সেই কৈশোরে।

জলে স্থলে প্রবাহিত এই দৃশ্যমালাকে পরবর্তী কালে তাঁর মনে হয়েছে যেন চিনের তাঙ যুগের এক দৃশ্যচিত্র। অনেক পরে পরিণত বয়সে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভারতীয় ভাস্কর্য বিষয়ে। ইংরাজীতে লেখা সেই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ডিনামিজম ইন ইন্ডিয়ান স্কাল্পচার'। সেই লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৮৪ তে ললিতকলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত কুমারস্বামী শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে। এই লেখাটিও তিনি শুরু করেছিলেন বেলতলি গ্রামের সেই কৈশোর স্মৃতি দিয়ে। অনুবীক্ষণের তলায় এক ফোঁটা জলের ভিতর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অন্তহীন জীবনের উপস্থিতি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন প্রখ্যাত অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী ইয়োহান মেন্ডেল। বিজ্ঞানীর সেই বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতিকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন শিল্পী। ভাস্কর্যের সেই প্রবন্ধে বলেছেন তিনি, পরবর্তী কালে সাঁচী স্তূপের দেয়ালে রিলিফ ভাস্কর্য দেখতে দেখতে সেই বিস্ময়ের অনুভূতি জেগেছিল তাঁর। আমাদের দেশের প্রকৃতি জীবন ও শিল্পের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র অনুভব করেছিলেন তিনি।

বৃহত্তর প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই যে প্রবহমান বাস্তবতাকে দেখা, এর মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিকতার বোধ কাজ করে। বাস্তবতা, জীবন ও আধ্যাত্মিকতা মিলে যায় এর মধ্যে। প্রাচ্যের শিল্পকলা, যেমন সাঁচীর ভাস্কর্য বা তাও যুগের দৃশ্যচিত্র, এই আধ্যাত্মবোধকেই প্রকাশ করে বাস্তবতার আবরণে। পরিতোষ সেনের জীবনবোধে রা নন্দনচেতনায় এরকম এক আধ্যাত্মিকতার মাত্রা সন্তর্পণে কাজ করে যায়। অথচ তাঁর যে শিল্পিত প্রকাশ তাতে আপাতভাবে বাস্তব - নিরপেক্ষ কোনও আধ্যাত্ম - পরিমণ্ডল শনাক্ত করা যায় না। চল্লিশের সাধারণ প্রবণতার সঙ্গে ঠিক মেলেও না বাস্তব - অতিক্রান্ত সেরকম কোনও আধ্যাত্মিকতা। এখানেই এক দ্বৈধ বা কনট্রাডিকশনের মুখোমুখী হই আমরা। তাঁর ছবির যে বাস্তবতার ভিত্তি তা কি শুধুই বিশুদ্ধ বাস্তব? তাতে নন্দনসমৃদ্ধ আধ্যাত্মিকতার রেশ আছে কতটা? এটা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে তাঁর ছবির নান্দনিকতাকে অনুধাবন করতে পারি আমরা।

আর একবার তাঁর শৈশবে ফিরে যাওয়া যেতে পারে। সেই বেলতলি গ্রামের অন্তহীন জীবনের প্রবাহময় প্রকৃতি, আর জিন্দাবাহার লেনের নানা সংঘাতে ভরপুর জীবন, তাঁদের বিরাট যৌথ পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের নানা সমস্যা ভারাক্রান্ত দৈনন্দিনতা—এই দুই বৈপরীত্যের এক সংঘাতও হয়তো প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর চেতনায় সেই শৈশব থেকেই। কোমল ও কঠোরের এই দ্বন্দ্বই তার শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার ছবির ভিত্তিগত বা প্রকাশগত বাস্তবতাকে বুঝে নিতে হয় আমাদের এই দ্বৈতের সংঘাতের ভিতর দিয়ে।

।। দুই।।

মানুষের চরিত্রে, মনে, মননের নির্মাণে সব সময়ই অজস্র বিপরীত শক্তির বা বিপরীত প্রবণতার সংঘাত চলে। এই দ্বৈতের সংঘাতের কোনও সরল সমাধান নেই। সাধারণত অনেক মানুষই ভাল ও মন্দের এই দ্বৈতকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সে যেটাকে ভাল বলে মনে করে, সেই 'ভাল' - কেই সে নিজের সহজাত গুণ বা শক্তির কেন্দ্র বলে বাইরের কাছে উপস্থাপিত করতে চায়। সাদা ও কালোর স্পষ্ট কোনও বিভাজন মানুষের চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের সাধারণত প্রবণতা নয়। সাদা ও কালো মিলে যে ধূসর ক্ষেত্র তৈরী হয়, তারই নানা ছায়া - প্রচ্ছায়ার সমন্বয় ও সংঘাতের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয় মানুষের ব্যক্তিত্ব। একজন শিল্পীর শিল্পীসত্তার নির্মাণে এই ধূসর ক্ষেত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিতোষ সেনের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে নিজেকে তিনি অনেকটাই অকপটে প্রকাশ করতে পারেন। বাস্তবকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে বা মেনে নিতে তাঁর কোনও কুণ্ঠা থাকে নি কখনও। তাঁর ব্যক্তিত্বের ও মননের এই সততা তাঁর সমগ্র প্রকাশেও প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিগত সততা শৈল্পিক সততায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে। তাঁর শিল্পের বাস্তবতা তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের ধূসর ক্ষেত্রগুলিকে তিনি তাঁর শিল্পেও সঞ্চারিত করতে পারেন।

বেলতলি ও জিন্দাবাহারের প্রাকৃতিক ও মানবকেন্দ্রিক নানা বৈপরীত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শৈশব থেকেই তাঁর চেতনার স্তরে স্তরে অজস্র ধূসর অভিজ্ঞতা শৈশব থেকেই তাঁর চেতনার স্তরে স্তরে অজস্র ধূসর আবহমণ্ডল তৈরী করেছে। বেলতলির স্থল ও জলে ব্যাপ্ত প্রকৃতিতে তিনি জীবনের ও সৌন্দর্যের পরিব্যাপ্ত উৎসারণ দেখছেন। তা তাঁর মধ্যে যে অনুভূতি জাগিয়েছিল তাকে এক ধরনের সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) বললে কি খুব ভুল হয়? তিনি যে ভারতীয় ভাস্কর্যে বা চৈনিক চিত্রকলায় এই

সর্বেশ্বরবাদেরই এক প্রতিফলন দেখেছিলেন, এতেও কি অসত্য আছে কোনও? এই এক সৌন্দর্যমগ্নতা সেই শৈশবেই তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। যদিও একথা জানি আমরা, তথাকথিত অর্থে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন।

এর পাশাপাশি জিন্দাবাহারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নামের বইয়েরই 'আমি' নিবন্ধে বলেছেন সেই ঘটনার কথা। সেই শৈশবেই প্রবল এক লোভে আক্রান্ত হয়েছিলেন একদিন। সেই লোভ ছিল সুখাদ্যের জন্য লোভ। সেই লোভ তাঁকে এক অমানবিক অপরাধে প্রবৃত্ত করেছিল। জিন্দাবাহারে তাঁদের বাড়ির কাছেই ছিল এক বাজার। নাম 'বাবুবাজার'। সেখানে ছিল সারি সারি মুসলমানী খাবারের দোকান। সেই খাবারের গন্ধে মাতোয়ারা চারদিক। ভাত, রুটি, পরোটা, মাংসের কাটলেট, শামি কাবাব, শিক কাবা১ব, কালেজা-কি সালন আরও কত কী। এই সব দেখে তার ''দশা তখন বাঘের কবলে হরিণ শাবকের মতো।'' প্রচণ্ড লোভে আক্রান্ত হলেন তিনি। কী করলেন তার পর? ছুটে চলে গেলেন আবার বাজারের দিকে। পথে পড়ে পাড়ার এক মসজিদ। সেই মসজিদের সামনে বসে থাকে এক অন্ধ ভিখিরি। তার সামনে একটি টিনের কৌটায় ছিল ভিক্ষার সংগ্রহ। কিছু আনি-দু-আনি এক পয়সা - দু পয়সা। অচল দুআনটি ফেললেন সেই পাত্রে। শব্দ হল টুং করে। দানের জন্য আশীর্বাদ করল ভিখিরিটি। তারপর সন্তর্পণে ভিখিরির পাত্র থেকে তুলে নিলেন কয়েকটি সচল এক আনি। ছুটে চলে গেলেন বাবুবাজারের খাবারের দোকানে। প্রাণের সাধ মিটিয়ে খেলেন সুখাদ্য যতটা পারা যায়। অনুভব করলেন অসীম তৃপ্তি।

এই অনৈতিকতাকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি তিনি। বেলতলি ও জিন্দাবাহারের বৈপরীত্যের এই হল একটি দৃষ্টান্ত। এই বৈপরীত্য তাঁর সামগ্রিক জীবনদৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। সাদা ও কালোর এরকম সংঘাতের ভিতর থেকে গড়ে উঠেছে তাঁর মননের ধূসর ক্ষেত্রগুলি। এই নৈতিক বিপর্যয়ের এক মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। সেই মনস্তত্ত্বকে না জানলে তাঁর শিল্পকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। জিন্দাবাহারে তাঁদের ছিল এক বিরাট যৌথ পরিবার। তাঁর পিতা প্রসন্ন কুমার সেন ছিলেন একজন নামকরা কবিরাজ, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। প্রসন্ন কুমারের পিতা ও পিতামহেরও ছিল এই একই পেশা। চিকিৎসক হিসেবে প্রসন্ন কুমারের খ্যাতি ও দক্ষতা অনেকটা পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ডাকসাইটে ও রাশভারী। তাঁর দুই পক্ষের স্ত্রীর মিলিত সন্তানের সংখ্যা কুড়ি। পরিতোষ তাঁর সপ্তদশতম সন্তান। তাঁর কনিষ্ঠতম সন্তানের জন্মের সময় প্রসন্ন কুমারের বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর।

এই কুড়িটি সন্তানের স্ত্রী পুত্র কন্যা ছাড়াও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন নিয়ে এই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে কেটেছে তাঁর শৈশব। পরিবারের সঙ্গে তাঁর সে অর্থে কোনও একাত্মতা গড়ে ওঠে নি। বরং এক বিচ্ছিন্নতা তাঁর শৈশবকে ভারাক্রান্ত করেছে। পারিবারিক সম্পর্কের ভিতর বা সংস্কৃতির ভিতর কোনও আনন্দের উৎস খুঁজে পান নি তিনি। বলেছেন, বাড়িতে বাবার চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকখানা ছেঁড়া পাতার বই ছাড়া অন্য কোনও বই খুঁজে পাওয়া যেত না। এমন কী রামায়ন মহাভারতও নয়। উৎকট রঙের কয়েকটি পুতুল, আর দেবদেবীর কয়েকটি বাঁধানো ছবি ছাড়া, শিল্পকর্মের কোনও চিহ্ন ছিল না। বাড়িতে। বলেছেন, ''এক কথায়, বিয়ে - থা, কিংবা কোনো পুজো - পার্বন ছাড়া সেন - পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ধারা একঘেয়েমির জাঁতাকলে পিষে হয়ে উঠেছিল নিতান্তই নীরস এবং ধূসর। এই ধূসরতা আমাকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে।''

এই মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা বিপর্যস্ত করেছে তাঁর শৈশবকে। পাশাপাশি একটা সৌন্দর্যের বোধও গড়ে উঠেছে তাঁর ভিতর শৈশব থেকেই একটা সহজাত প্রতিভা বলা যেতে পারে একে। এই সহজাত বোধ থেকেই তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হতে পারতেন। দর্জি হাফিজ মিঞার পোষাক তৈরির শৈল্পিক নৈপুণ্যে বা পায়রা ওড়ানোর অসামান্য মুন্সিয়ানায়, সিন - পেন্টার জিতেন গোঁসাই-র অঙ্কনের দক্ষতায়, ডেন্টিস্ট আখতার মিঞার কাল্পনিক গল্প বানানোর প্রতিভায়। ঢাকা জেলায় তাঁদের গ্রামের সেই বিরাট অর্জুন গাছ তাঁর কল্পনাকে নানাভাবে উদ্দীপিত করত, নিম্নবর্গীয় এক বৃদ্ধা নারী জামিলার মা-র মানবিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মীষ্ঠতা তাঁকে শ্রদ্ধাবনত করত। এই যে মনস্তাত্ত্বিক বৈপরীত্য, যার নাম দেওয়া যেতে পারে বেলতলি - জিন্দাবাহার বৈপরীত্য, সেটাই তাঁর বাস্তবতা বোধকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাস্তবতা বোধকে সৌন্দর্যবোধে জারিত করেছে। সেই সমন্বয় থেকে গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্প।

তাঁর শিল্পের আর একটি যে বৈশিষ্ট্য, শরীরময়তা বা সেনসুয়ালিটি, সেটাও হয়তো শৈশবের সেই বাস্তবতা থেকেই এসেছে। যৌথ পরিবারের সেই শিশুটিকে তখনও কেউ পরিণত পুরুষ বলে গণ্য করত না। ফলে আত্মীয় পরিজনের মধ্যে যুবতী নারীর অনাবৃত শরীর অনেক সময়ই উন্মোচিত হত তাঁর সামনে। সেরকম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমরা অনেক পাই তাঁর লেখায়। এই ইন্দ্রিয়ময়তা শুধু নারীর শরীরের রূপায়ণে নয়, তাঁর সমগ্র প্রকাশেরই অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। তাঁর সমগ্র বাস্তবতার বোধই শরীর সম্পৃক্ত। এবং গাঠনিক। পরবর্তী জীবনে, তাঁর পরিণত পর্বে, রূপের নির্মাণে তিনি যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার পোস্ট কিউবিস্ট বা উত্তর - ঘনকবাদী আঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এর একটা কারণ হতে পারে তাঁর মনস্তত্ত্বের অন্তর্গত সেই শারীরিকতা বা গাঠনিকতার প্রতি সহজাত আকর্ষণ। কিউবিজমের জ্যামিতি দিয়ে তিনি সেই গাঠনিকতাকেই প্রগাঢ় করতে পেরেছেন।

কিন্তু কিউবিজম সত্ত্বেও, পাশ্চাত্য আধুনিকতার আঙ্গিকে মগ্নতা সত্ত্বেও, আমাদের মনে রাখতে হয়, তাঁর মননের এবং সেজন্যই তাঁর সৃজনের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত ছিল তাঁর স্বভূমিতে। সারা জীবন তিনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর পরিক্রমার ক্রমটা অনেকটা এরকম। ঢাকার জিন্দাবাহার, বেলতলি, সেখান থেকে মাদ্রাজ; তারপর কলকাতা, ইন্দো, প্যারিস, কলকাতা, রাঁচির নেতারহাট, তারপর স্থায়ীভাবে কলকাতা। এর পরেও তিনি ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকায় গেছেন। যখনই যেখানে গেছেন, সেখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে কিছু। সঞ্চিত হয়েছে তাঁর চেতনায়। প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শিল্পে। কিন্তু মূল থেকে তিনি কখনও উৎপাটিত হন নি। তাঁর আধুনিকতার চেতনায় এবং রূপ - ভাবনায় কোথায় এবং কেমন করে মিশে থাকে তাঁর অস্তিত্বের শিকড়, এটা উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর শিল্পকে সম্পূর্ণ অনুধাবন করা যায় না। তাঁর কাজে এই শিকড়ের টান, এই নস্টালজিয়াকে তিনি এখনও অনুভব করেন। এক সাক্ষাৎকারে

বলেছিলেন কিছুদিন আগে ঃ ''জন্মভূমির প্রতি গভীর নাড়ির টান না থাকলে তো ওরকম লেখা যায় না। কোনও সৃজনশীল কাজই করা যায় না।...ঢাকার প্রতি এই অন্তরের টান আমার এখনও কাজ করে। এই যে প্রাণের টান, আত্মিকতা— সেটা আমার সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছে।'' (বসুধারা, ১৫ আগস্ট ২০০২, দেবাশিস চন্দ্রের নেওয়া সাক্ষাৎকার। পৃষ্ঠা ৭৪)।

তাঁর ছবির জগৎ শুরু হয়েছিল স্বদেশ চেতনা থেকে। তারপর তা বিশ্ব পরিক্রমা করেছে। পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে আত্মস্থ করেছে। তার সঙ্গে মিলিয়েছে দেশজ ঐতিহ্যের সারাৎসারকে। ক্রমান্বয়ে পরিণত পর্বের দিকে এসে নিজস্ব পরিমণ্ডলের অনুভবের জগৎই বেশি করে আলোকিত হয়েছে। তিনি গড়ে তুলেছেন যে নিজস্ব 'রূপ', তাতে শুধু বিষয়ে নয়, আঙ্গিকেরও স্বদেশ প্রতিফলিত হয়েছে অজস্র ধারায়। 'গ্লোবাল' -এর গাঠনিকতার ভিতর দিয়ে এই যে 'লোকাল' -কে বিশ্লেষণ করা। এটাই তাঁর শেষ পর্বের ছবিকে বিশেষভাবে ঋদ্ধ করেছে।

১৯৪০ থেকে এখন এই ২০০৫ পর্যন্ত এই সাড়ে ছয় দশক ধরে তিনি অবিরত কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ছবির বিবর্তনের দিকে আমরা ধীরে ধীরে আসব পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় তাঁর সন্ধানের স্থির কোনও কেন্দ্র কি আছে? সময়ের আলোড়নের সঙ্গে তিনি সব সময়ই নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। সেই আলোড়নের অভিঘাতেই গড়ে উঠেছে তাঁর 'রূপ'। এই 'রূপ' সবসময়ই হয়েছে মানুষ কেন্দ্রিক, জীব কেন্দ্রিক। একেবারে শেষ পর্বে এসে যেভাবে তিনি বিশ্বকে স্বদেশের ভিতর সঞ্চারিত করেছেন, ভালবাসায়, মমতায়, কৌতুকে, করুণায় যেভাবে প্রবহমান জীবনকে নন্দিত করেছেন, বাস্তবতার সেই উদ্ভাসই শিল্পী হিসেবে তাঁকে এক আলোকিত পাদপীঠ দিয়েছে।

।। তিন।।

তাঁর শিল্পে বাস্তবতার ভিত্তি গড়ে ওঠার আর একটি প্রধান উৎস ১৯৪০ -এর দশকের সামাজিক বাস্তবতা। সেখানে আমরা আসব একটু পরে। তিনি ছবি আঁকার জগতে প্রবেশ করেছেন তাঁর একান্ত নিজের ইচ্ছায়। বা প্রবল ইচ্ছার জোরে। ভিজুয়ালিটি বা দৃশ্যতার প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। দু-রকমের দেখা আছে। কেউ কেউ দেখেন সমগ্রকে মিলিয়ে। সামগ্রিকতা থেকে এককে আসেন। কেউ বা একককেই দেখেন নিবিড় নিবিষ্টতায়, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে। তারপর একক থেকে সমগ্র পৌঁছাতে চান। প্রথমটি যদি হয় দার্শনিকে দেখা, তাহলে দ্বিতীয় ধরনের দেখায় থাকে রূপশিল্পীর চেতনার প্রকাশ। এই দ্বিতীয় দেখা অনেকটা শরীরময় বা সংবেদনময় দেখা। পরিতোষ সেনের আত্মস্মৃতিমূলক বা আখ্যানমূলক লেখা থেকে বোঝা যায় শৈশব থেকে এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই ছিল তাঁর শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু সে রকম কোনও উত্তরাধিকার তাঁর ছিল না। বাড়িতে কোনও সৌন্দর্যতেনার পরিমণ্ডল ছিল না, জেনেছি আমরা আগে। তবে এও বলেছেন তিনি এক কাকা ছিলেন, যিনি আঁকতে পারতেন। পাড়ার যত বিয়ের পিড়ি আঁকার ভার পড়ত তাঁর উপর। সেই কাকার স্ত্রী অর্থাৎ তাঁর খুড়িমার কথা খুব মজা করে উদ্ধৃত করেছেন পরিতোষ সেন। তাঁর খুড়িমা নাকি তাঁকে বলেছিলেন একবার ঃ

''তুমার খুড়ায় এমন সুন্দর বিয়ার পিঁড়ি আঁকতেন, বিয়ার কুলা আঁকতেন যে পাড়ার লোক চাইয়া থাকত। তিনি যদি আইজ বাইচা থাকতেন, তাইলে তুমারে আর মাদ্রাজে আর্ট স্কুলে যাইতে হইত না।''

('বসুধরা' পত্রিকার পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার)

সে যাই হোক, স্কুলে পড়ার সময় বইতে বা পত্রপত্রিকায় ছাপা ছবি, বিশেষত বিখ্যাত মানুষদের প্রতিকৃতি দেখে দেখে আঁকার চেষ্টা করতেন তিনি। আর তাতে যথেষ্ট হাতও পাকিয়েছিলেন। আঁকিয়ে হিসেবে যথেষ্ট সুনামও হয়েছিল স্কুলে। স্কুলের শেষ ধাপে পৌঁছে এই সংকল্প দৃঢ় হয়েছিল তাঁর মনে যে শিল্পী হওয়াই তাঁর জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর (১৮৯৯-১৯৭৫) নাম শুনেছেন তখন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেখেছেন তাঁর ছবি। দেবীপ্রসাদ তখন মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। শিল্পী হিসেবে তাঁকেই আদর্শ বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। ভাবছিলেন, ছবি আঁকা শিখতে যদি হয় শিখবেন, তার কাছেই। স্কুলের পাঠ শেষ হলে মাদ্রাজ যাওয়ার জন্যই মন স্থির করলেন। বাড়িতে তাঁর দাদা তখন অভিভাবক। বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। শিল্পী হওয়া তখন এক নগন্য বৃত্তি বলে গণ্য হত। তাই পরিবারের সকলেরই ছিল প্রবল আপত্তি। একমাত্র নীরব সম্মতি ছিল তাঁর মার। সেইটুকু ভরসা আর প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে ১৯৩৬ সালে মাত্র ১৭ বছর বয়সে ঢাকা থেকে একা পাড়ি দিলেন মাদ্রাজে। এর আগে দেবীপ্রসাদকে চিঠি লিখে, ছবি পাঠিয়ে তাঁর সম্পতি আদায় করেছেন। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন তৃতীয় বর্ষে। আঁকার দক্ষতার জন্য দুবছর এগিয়ে ভর্তি করে নেওয়া হল তাঁকে।

সেই থেকে তাঁর শিল্পী জীবনের সূচনা। এই সূচনাপর্বে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কয়েকটি প্রবণতা প্রোথিত ছিল তাঁর মধ্যে। এর খানিকটা সহজাত বোধ থেকে জাত। খানিকটা পারিবারিক পরিমণ্ডল ও চারপাশের প্রকৃতি, সমাজ ও জীবন থেকে উদ্ভূত। এ সম্পর্কে আমরা কিছুটা জেনেছি আগে। এগুলি হল তাঁর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি, প্রকৃতি ও জীবনের বিস্তীর্ণতার প্রতি বিস্ময়ের বোধ, আবার এরই সঙ্গে বিপরীতধর্মী এক কুশ্রীতার সংঘাত, তাঁর সংবেদনময় বা শরীরময় (sensuous) যৌনচেতনা, আবার পূর্বোক্ত সংঘাত থেকে এক গাঠনিক ও বিশ্লেণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি।

সেই ১৭ বছর বয়সে যখন তিনি মাদ্রাজ আট স্কুলে পৌঁছালেন, তখন তাঁর প্রকাশের মধ্যে এই প্রবণতাগুলি যে খুব স্পষ্ট ছিল, তা নয়। বরং সুপ্তই ছিল তখন। কিন্তু এই মনোভঙ্গি থেকেই তিনি যখন ছবি দেখেছেন, চারপাশের জীবন ও বিশ্বকে দেখেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরিস্ফুট হবে আরও পরে। ১৯৪০-এর দশকের বাস্তবতাই তাঁর এই নিজস্ব প্রবণতাগুলিকে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করবে। ততটা দেবীপ্রসাদ বা নব্য - ভারতীয় ঘরানার আবহ নয় যতটা চল্লিশের বাস্তবতা তাঁক চালিত করেছে তাঁর নিজস্ব শিল্পের বিশ্বের সন্ধানে। এ জন্যই তাঁকে আমরা বলতে পারি চল্লিশের শিল্পী বা ১৯৪০-এর দশকে

প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত শিল্পী। তবু দেবীপ্রসাদ বা নব্য - ভারতীয় ঘরানা তাঁর শিল্পীচেতনাকে অনেক সময় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে। তখনকার শিল্পের পরিমণ্ডলে স্বদেশচেতনার আবহ ছিল যথেষ্ট প্রবল। দেবীপ্রসাদ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য। ছবিতে তাঁর ঘরানার অনুগামী। যদিও ভাস্কর হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বেশি, কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যে নব্য - ভারতীয় ঘরানার প্রভাব বিশেষ ছিল না। সেখানে অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। বড় জোর রদাঁ বা বুর্দেল পর্যন্ত এগিয়েছেন। দেবীপ্রসাদের প্রভাব বা তাঁরও আগে থেকে বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় নব্য - ভারতীয় ঘরানার ছবি দেখার প্রতিক্রিয়ায় পরিতোষ সেন ১৯৪০-এর আগে পর্যন্ত এই নব্য - ভারতীয় আঙ্গিককে নানাভাবে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন। সেই সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করবো। কিন্তু তাঁর স্বকীয় প্রকাশভঙ্গি গড়ে তুলতে ১৯৪০-এর বাস্তবতাই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে।

১৯৪০ -এর দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। গান্ধিজির নেতৃত্বে ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রায় সমস্ত দেশবাসীর মনেই প্রবল উদ্দীপনা জাগিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ এসে লাগছে এ দেশেও। ব্রিটিশ রাজশক্তি তখন পর্যুদস্ত এই যুদ্ধে। জাপান বার্মা অতিক্রম করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। তাদের মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চাইছে সরকার। বিপুল পরিমাণ ব্রিটিশ সৈন্য এসে ঘাঁটি গেড়েছে এই কলকাতায়। তাদের খাওয়ানোর জন্য সংগৃহীত হচ্ছে দেশের সমস্ত খাদ্যশস্য। দেশবাসীর জন্য সরকারের কোনও দায় নেই। খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার যথেষ্ট হলেও, দেশবাসীর কাছে তা পৌঁছাচ্ছে না। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে প্রবল দুর্ভিক্ষ।

১৯৪৩ -এর সেই মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ সারা বাংলাকে বিভৎসভাবে বিপর্যস্ত করল। এই বাস্তবতা সচেতন মানুষকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। এদিকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রগাঢ় হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর একদিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাগছে প্রতিবাদী আন্দোলন। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলেকে তা গভীরভাবে আলোড়িত করছে, সাহিত্য বা শিল্পকলা যে জীবন নিরপেক্ষ নয়, সমাজ বাস্তবতাই যে তাঁর প্রধান নিয়ন্ত্রক, এ বিষয়ে সচেতনা জাগছে তরুণ সংস্কৃতিকর্মীদের মনে। গড়ে উঠেছে আই.পি.টি.এ. বা ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন। দৃশ্যকলার ক্ষেত্রেও সমাজ বাস্তবতার এই ঢেউ এসে লাগছে।

১৯৪০ সালে পরিতোষ সেন মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের পাঠক্রম শেষ করে যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন এই বাস্তবতা তাঁকেও গভীরভাবে নাড়া দিল। এতদিন তিনি যে ছবি আঁকছিলেন, তাতে নব্য-ভারতীয় ঘরানার প্রভাব ছিল অনেকটাই। দেবীব্রসাদ ও মাদ্রাজ আট স্কুলের শিক্ষকদের পরিচালনায় ছবির নানা আঙ্গিক নিয়ে অনুশলীন করেছেন প্রচুর। স্বাভাবিকতার রীতিতেও তাঁর দক্ষতা গড়ে উঠেছে যথেষ্ট। তবু ১৯৪০-এ কলকাতায় ফিরে তাঁর মনে হল, এই ভিত্তির উপর এবার তাঁকে গড়ে তুলতে হবে নিজের প্রকাশের পথ, তাঁর নিজস্ব আঙ্গিক। বাস্তবতার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ বরাবরই ছিল। তখনকার আলোড়িত ও ক্ষরিষ্ণু বাস্তবতাকে প্রকাশ করার জন্য যে আধুনিকতার নতুন ভাষা গড়ে তুলতে হবে, এই বোধও জাগল তখন।

মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে থাকার সময় ইউরোপের আধুনিক শিল্প আন্দোলনগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয় নি তাঁর। এ ব্যাপারে দেবীপ্রসাদ সম্পর্কেও পরবর্তীকালে অভিযোগ তৈরী হয়েছে তাঁর মনে। মাদ্রাজের শিক্ষা ব্যবস্থা এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা বেড়েছে ক্রমশ। তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে ইউরোপ তেকে প্রচুর সৈনিক আসছে এদেশে। তাঁদের প্রয়োজনে আসছে প্রচুর বিদেশী বই। বিদেশী ছবির বই তখন অনেক সহজলভ্য হয়েছে কলকাতায়। ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম থেকে কিউবিজম পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প আন্দোলন ও এই সব ধারার বিভিন্ন শিল্পীর ছবি দেখার সুযোগ হল তাঁর এই সব বইয়ের মাধ্যমে তাঁর মনে হল, আধুনিকতার বিপর্যস্ত বাস্তবতার দৃশ্যরূপ গড়ে তুলতে এই চিত্রভাবনাকে নানাভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে লৌকিক চিত্রের যে বিপুল বিস্তার ছিল, নব্য - ভারতীয় আন্দোলন তার সূচনা পর্বে অন্তত ১৯২০-র আগে পর্যন্ত সে দিকটাতেও ভাল করে নজর দিতে পারে নি। ১৯৩০-এর দশকে মাঝামাঝি সময় থেকে সে সম্পর্কে কিছু সচেতনতা জাগছে। যামিনী রায় এই উৎস থেকে গড়ে তুলছেন তাঁর নিজের চিত্রীয় দর্শন। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুও ১৯৩০ এর দশকের শেষ পর্যায়ে লৌকিক ভারতীয়তাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন তাঁদের ছবির আঙ্গিকে। এ বিষয়ে সুনয়নী দেবীর অবদানও স্মরণযোগ্য। গান্ধিজি রাজনৈতিক আন্দেলনকে যেভাবে গ্রামের দিকে, নিম্নবর্গীয় মানুষের দিকে প্রসারিত করেছিলেন, তারই এক ফলশ্রুতি ছিল লৌকিক সম্পর্কে এই সচেতনতা। চল্লিশের তরুণ শিল্পীরা যামিনী রায়ের লৌকিক আঙ্গিকের উজ্জীবন দ্বারা গভীরভাবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন।

পরিতোষ সেন চল্লিশের দশকের গোড়ায় এই বাস্তবতা দ্বারা আলোড়িত হচ্ছেন। এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ছাত্র অবস্থায় অর্জিত রূপবোধের সঙ্গে দুটি উৎসকে মেলাতে চেষ্টা করেছেন। একটি ভারতীয় লৌকিক। দ্বিতীয়টি ইউরোপীয় আধুনিকতার আঙ্গিক। মোটামুটি এই তিনটি উৎসের সমন্বয়ে, গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। এই আলোড়িত সময়ে এক প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট নয়, এই বোধও জাগছে তাঁর মনে। তাঁর সমবয়স্ক ও সমমনস্ক শিল্পীদের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছেন 'ক্যালকাটা গ্রুপ'। ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত এই দলের শিল্পীদের সম্মিলিত উদ্যোগ ভারতীয় শিল্পকলার আধুনিকতায় নতুন অভিঘাত এনেছিল। সে সম্পর্কেও আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। চল্লিশের এই সামগ্রিক পরিস্থিতি পরিতোষ সেনের বাস্তবচেতনা ও নন্দন চেতনাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে।

।। চার।।

১৯৪০ -এ মাত্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে কিছুদিন থাকার পর ওই বছরই পরিতোষ সেন চলে যান ইন্দোরে, ওখানকার ডেলি কলেজে শিল্পশিক্ষকতার চাকরি নিয়ে। ১৯৪৯ পর্যন্ত চাকরি করেন ওখানে। কলকাতার সঙ্গে তখন যোগাযোগ রেখেছেন ওখান থেকেই। 'ক্যালকাটা গ্রুপ' -এর প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন নিয়মিত। ভিতরে ভিতরে তখন অনুভব করেছেন পশ্চিমমুখী টান। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলার প্রতি তাঁর তখন প্রবল আগ্রহ। সেই আধুনিকতার প্রাণকেন্দ্র ফ্রান্স বা প্যারিস শহর। সেখানে যাওয়ার স্বপ্ন তাঁর চল্লিশ দশকের গোড়া থেকেই। সেই স্বপ্ন সফল হতে সময় লাগল প্রায় এক দশক।

বিদেশে যাওয়ার মত আর্থিক সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না। তবুও ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়—এই বিশ্বাসে নির্ভর করে চেষ্টা করেছেন। উপায় হয়েছে অবশেষে। একটি টিকিট ও কয়েকশো টাকা সম্বল করে ১৯৪৯ সালে তিনি পাড়ি দিলেন ইউরোপের পথে। ডেনমার্কে ভারতীয় দূতাবাসের আনুকূল্যে সেখানে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর। সেই প্রদর্শনী থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ হওয়ায় সহজতর হয়েছিল তাঁর ইউরোপ যাত্রা। প্যারিস ছিল তাঁর লক্ষ্য। অবশেষে পৌঁছালেন ১৯৫০ -এর শীতের প্রারম্ভে।

প্যারিসে তাঁকে যুক্ত থাকতে হয়েছিল কয়েকটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে রয়েছে আঁদ্রে লোহতে-র স্কুল। অ্যাকাডেমি গ্রাণ্ড শমিয়ের, একোল ডি বোজার্ত এবং একোল ডি লুভরে। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি পড়েছেন শিল্প - ইতিহাস। কিন্তু ওখানে তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ঘটেছে দেখার মধ্য দিয়ে। অবিরত দেখেছেন বিভিন্ন মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি। সারা বিশ্বের অনাদিকালের শিল্প - ইতিহাসের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছে সেখানে। ছয় নক্ষত্রের দীপ্তিতে ভাস্কর তখন প্যারিসের শিল্পের আবহমণ্ডল। তাঁরা হলেন পিকাসো, ব্রাক, মাতিস, শাগাল, রুয়ো এবাং ব্রুকুসি। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিল্পী তখন কাজ করছেন ওখানে। সক্রিয় রয়েছে কয়েকশ আর্ট গ্যালারি। বিপুল এই শিল্পের কর্মকাণ্ডে নতুন উদ্দীপনায় দীপ্ত তখন তিনি।

প্যারিসের এই মহামিলনমেলায় এসে কী লিখেছিলেন তি নি? তিনি নিজেই বলেছেন সে সম্পর্কে এক জায়গায়। ছবিতে বিষয় ও আঙ্গিকের সম্পর্ক সম্বন্ধে এতদিন যা জেনেছিলেন তিনি, এখানে এসে দেখলেন, আধুনিকতা সেই সম্পর্কটাকে একেবারে উল্টে দিয়েছে। ছবি থেকে আখ্যানের অনুষঙ্গ একেবারেই বিবর্জিত হয়ে গেছে। গল্প বলা নয়, আঙ্গিক বা শিল্পীর নিজস্ব স্টাইলটাই ছবির দৃশ্যতার মূল উপাদান। একটি অতি সাধারণ বস্তুই হতে পারে শিল্পের বিষয়। তার উপস্থাপনার ভিতর দিয়েই পরিস্ফুট হতে পারে শিল্পীর সমগ্র বিশ্বদৃষ্টি। যার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ভ্যান গঘের 'চেয়ার' বা একটি পরিত্যক্ত বুট জুতো। তাঁর নিজের উক্তিতে ঃ

''One of the important lessons I learnt during my stay in Paris was the reversal of the old-Subject - Picture relationship. The Picture now as a picture took the lead by a total elimination of story-telling. The artist's aim, I felt, must be to subdue all tings to his style beginning with the simplest, lest promising objects as exemplifed in Van Gogh's paninting of an empty chair or a pair of discarded boots. (Paritos Sen Retrospect' Mapin Publishing, Ahmedabad. P-60)

এই উপলব্ধি শুধু তাঁরই নয়, ভারতবর্ষে ১৯৪০-এর দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত শিল্পীদের কাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

এই থেকেই উদ্ভূত হয়েছে চল্লিশের শিল্পীদের প্রকাশের একটি সমস্যা। সে সম্পর্কে আমরা একটু পরে আসছি। প্যারিসে অবস্থান কালে পরিতোষ সেনের শ্রেষ্ঠ অর্জন ছিল পিকাসোর সান্নিধ্যে আসা, বা পিকাসোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এটাকেই তিনি বলেছেন, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত লিখেছেনও তিনি। পিকাসোর প্রতি তাঁর মুগ্ধতা সেই সময় থেকে তাঁর রূপচেতনায় প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। সেই প্রভাব তাঁর সারা জীবন ধরে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। এর রেশ রয়ে গেছে আজও। ইউরোপের আধুনিক চিত্রকলা সেজান -এ এসে নতুন বাঁক নিয়েছে। গাঠনিকতায় মধ্যে বস্তুর বা প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গাঠনিকতাই পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে কিউবিজমে। কিউবিজমের এই গাঠনিক বিশ্লেষণের আদিম ও প্রত্ন ভাস্কর্যের কিছু প্রভাব রয়েছে। পিকাসোর ১৯০৭ সালের বিখ্যাত 'অ্যাভিনির নারীর' ছবিতে কিউবিজমের পূর্বাভাসের কথা অনেকেই বলেছেন। ওই ছবিটিতে নারীদের মুখমণ্ডলের ভাঙনে ইবেরিয়ান ভাস্কর্যের প্রভাবের কথা সুবিদিত। কিউবিজম পাশ্চত্য আধুনিকতার দৃশ্যতার দর্শনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছিল। আধুনিক পৃথিবীতে জীবনের ও মননের যে জটিলতা, তাকে দৃশ্যতার ভাষায় ধরার পক্ষে এই আঙ্গিকের অবদান গভীর। এজন্যই কিউবিজম সারা পৃথিবীরই আধুনিক শিল্পকলাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের দেশে চল্লিশের শিল্পীরা যখন সেই সময়ের জটিলতাকে ধরতে চাইলেন তাঁদের ছবিতে, তখন পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনেক আঙ্গিকের সঙ্গে কিউবিজমকেও তাঁরা ব্যবহার করলেন। চল্লিশের শিল্পীদের অনেকের কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিউবিজমের যথেষ্ট অভিঘাত আছে। পরিতোষ সেনও এই আঙ্গিককে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। এই আঙ্গিকের সঙ্গে ভারতীয় লৌকিক ও অনুচিত্রের সারাৎসারকে মিলিয়ে তিনি তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন নিজস্ব রূপকল্প। তাঁর ১৯৫০ - দশকের পরবর্তী ছবিতে এর পরিচয় আছে।

ইউরোপের উচ্চ - আধুনিকতার আঙ্গিককে প্রাধান্য দিয়ে চল্লিশের শিল্পীরা আখ্যান নিরপেক্ষ যে রূপকল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফর্ম-উটসেল্ফ বা রূপের স্বরাটত্বের নির্মাণ। নব্য-ভারতীয় ঘরানার ছিল আখ্যানের প্রাধান্য ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য। চল্লিশের শিল্পীরা একে পরিহার করতে চেয়েছিলেন। ভাবালুতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে চেয়েছিলেন। চিত্রের আঙ্গিককে স্বরাট বা আত্মনির্ভর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের অতিরিক্ত পাশ্চাত্য নির্ভরতা পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে। উচ্চ - আধুনিকতার উপর বেশি রকম নির্ভরতায় তাঁরা ঐতিহ্যের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, এরকম মনে করেছেন অনেকে। আধুনিকতার কোনও নিজস্ব আত্মপরিচয় তৈরী করতে পারেন নি তাঁরা। এরকম সমালোচনাও হয়েছে।

এই অভিযোগগুলি হয়তে একেবারে অমূলক নয়। ১৯৪০ -এর দশকের শিল্পীদের সামনে অনেকগুলি বড় সমস্যা ছিল। নব্য-ভারতীয় চিত্রধারা, যে ভাবালুতাপূর্ণ গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল, তাকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি। স্বদেশে এবং সারা বিশ্ব জুড়ে বাস্তবতার যে আলোড়ন, তাঁদের শিল্পের মধ্যে এর প্রতিফলন থাকবে, এটাও চাইছিলেন তাঁরা, আধুনিক শিল্পের ভাষাকে তাঁরা করতে চাইছিলেন আন্তর্জাতিক। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বা অভীষ্টকে একসঙ্গে মেলাতে গিয়ে প্রথম পর্বে তাঁরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। এর সুচারু সমাধান আসতে খানিকটা সময় লেগেছে। এই সমস্যাই প্রথম পর্যায়ে ভারাক্রান্ত করেছে অনেক শিল্পীর পরীক্ষা- নিরীক্ষাকে।

পরিতোষ সেনের ছবিও এই সমস্যার মধ্য দিয়ে গেছে। নানা আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছেন তাঁর সমস্ত

সন্ধানের পিছনে আজীবন কাজ করেছে একটি বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতাকে তিনি নিবিড়ভাবে বুঝতে চেয়েছেন। বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। সেই বাস্তবতা একদিকে সমাজের প্রবহমান বাস্তবতা, সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের অন্তর্গত সমস্যা ভারাক্রান্ত বাস্তবতা। এক কথায় কালচেতনার বাস্তবতা। অন্যদিকে বিষয়ের বা বস্তুর গঠনগত বাস্তবতা। এই দুই বাস্তবতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর শিল্পের নন্দন।

তাঁর প্রথম পর্বের ছবিতে নব্য-ভারতীয় ঘরানার রেশ ছিল। তাঁর শৈশব ও কৈশোরে এই ছবিই তিনি দেখেছেন বেশি। সেই পর্যায়ে রাজনীতির যেমন, তেমনি শিল্পের স্বদেশ - চেতনা সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে যে তিনি শিক্ষক হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন, এরও প্রধান কারণ সম্ভবত এটাই। অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের প্রতি তিনি চিরদিনই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যখন তিনি নব্য - ভারতীয় ঘরানাকে পরিহার করেছেন, তখনও তাঁদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা হারান নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রথম, পর্বে তাঁর নিজের ছবিতে এই ঘরানার রেশ এসেছে।

১৯৪০ -এর দশকের ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে কাঠোর বাস্তবতার প্রতি মনোযোগী হতে উদ্বুদ্ধ করল। ছবিতে সেই বাস্তবতার প্রতিফলন জরুরি, এটা উপলব্ধি করলেন তিনি। তখন পাশ্চাত্য- আধুনিকতার আঙ্গিককে আত্তীকৃত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন। শুধু ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থেকেই নয়, পিকাসোর সামগ্রিক কৃতি আধুনিক শিল্পের দিগন্তকে যেভাবে প্রসারিত করেছে, সেই উপলব্ধি থেকেই পিকাসোর আঙ্গিক তিনি আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেছেন। বিশেষত, তাঁর উত্তর ঘনকবাদী আঙ্গিক। কিন্তু এই আঙ্গিকের মধ্যেই তাঁর 'রূপ' সীমিত থাকে নি। এর সঙ্গে তিনি নানাভাবে দেশজ নানা আঙ্গিককে মিলিয়েছেন। তবু একটা পর্যায়ে পাশ্চাত্য নির্ভরতা তাঁর কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। এটা চল্লিশের শিল্পেরই অনিবার্য বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাঁর ছবিতে স্বদেশ ও বিশ্বের সমন্বয় প্রক্রিয়া অধিকতর মাত্রায় সক্রিয় হতে থেকেছে। কিউবিজমের সেই ভিত্তি ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রবহমান জীবনের সুখ দুঃখ আশা আনন্দ হতাশা সমস্তই ভালবাসায় কৌতুকে বিদ্রূপে রূপবন্ধ করেছেন তিনি। অনাবৃত করেছেন চারপাশের হিংসার পরিবেশে। নিজেকে নিয়ে নানাভাবে কৌতুক করেছেন। আত্মপ্রতিকৃতি হয়ে উঠেছে তাঁর প্রধান এক প্রকাশের মাধ্যম। শরীর সব সময়ই তার ছবিতে সৃষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়। শরীরের ভিতর দিয়েই তিনি প্রকাশ করেন সময়ের জ্বর ও জ্বালা। সময়ের মধ্যে প্রতিফলিত তাঁর ভালবাসা। এখন তাঁর যে আঙ্গিক তা একই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত, দেশজ ও আন্তর্জাতিক। এই সমন্বিত রূপকল্পের ভিতর দিয়েই তাঁর ছবি সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় বিশেষ এক স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

এখন এই ২০০৫ সালে, তাঁর বয়স প্রায় ৮৭। জীবনের শেষ পর্যন্ত যেভাবে যৌবনের দীপ্তিতে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁর সেই সৃজননের ব্যাপ্তি ও জীবনভাবনা নবীন প্রজন্মকে উদ্দীপ্ত করার মতো। এবছরই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল তাঁর এক বড় একক। সেই প্রদর্শনীর ছবিগুলোর দিকে নিবিষ্টভাবে তাকালে আমরা তাঁর প্রকাশের মূল প্রবণতাগুলি বুঝতে পারি।

তিনটি ছবির কথা উল্লেখ করতে হয় প্রথমেই। তিনটিরই বিষয় সাধু। একটিতে বাঘের ছালের উপর বসে কয়েকজন সাধু গাঁজা খাচ্ছে। দ্বিতীয়টিতে তারা যজ্ঞ করছে। তৃতীয়টিতে তিন সাধু একই মোটরবাইকে বসে দ্রুত ধাবমান। একজন চালাচ্ছেন, দুজন পিছনে বসে। প্রত্যেকেরই চোখে কালো রোদ চশমা। একজনের হাতে ত্রিশুল। অন্য একজনের হাতে মোবাইল ফোন। মাথায় জট, লম্বা দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কৌপীন পরা, খালি গা, মুখে অদ্ভুত এক খুশির বা বিজয়ের হাসি। বর্নিল প্রেক্ষাপটে তাঁদের স্থুল শরীর সাদা আর ধূসরের মিশ্রণে গড়া। হিন্দুত্বের যখন জয়জয়কার চারদিকে, হিন্দুত্ব যখন প্রকটভাবে হয়ে উঠেছে রাজনীতির চাবিকাটি, তখন শিল্পী এ ভাবেই বিদ্রূপের কশাঘাত করেছেন এই ধর্মীয় সন্ত্রাসকে। তাঁর শিল্পচেতনার ও বাস্তবচেতনার মূলত প্রবণতা ধরা পড়ে এই ছবি তিনটিতে।

পরিবৃত হিংসার অনেক ছায়াপ্রচ্ছায়াকে তিনি অনাবৃত করেন সূক্ষ্ম কৌতুকে সাধারণ জীবনপ্রবাহ থেকে প্রতিমাকল্প তুলে এনে। মুরগির দুটো ঠ্যাং ধরে বাজার থেকে ফিরছে যুবতী, কলাপাতায় ছড়িয়ে আছে মাছের কাটা মাথা, সাপের বিষদাঁত ভাঙছে সাপুড়ে, এরকম প্রতিমাকল্পে জড়ানো থাকছে প্রচ্ছন্ন হিংসার আবহ। পাশাপাশি নিভৃত এক সৌন্দর্যেরও উন্মীলন চলে। হারমোনিয়াম বা দিলরুবা নিয়ে সংগীতে নিমগ্না দুই নারী। বা কাঠিতে ফুঁ দিয়ে বুদবুদ ছড়াচ্ছে কিশোরী মেয়ে। এরকম সহজ বিষয় নিয়ে করা ছবির সৌন্দর্যের মধ্যেও থাকে বিষণ্ণ এক করুণা, এক শূন্যতা বোধ থেকে উঠে আসে যা। এই শূন্যতা দিয়েই তাঁর ছবিতে তিনি সময়ের প্রতিকৃতি এঁকে চলেন অবিরত।

এই বিপুল জীবনের ব্যাপ্ত বাস্তবতার বৈচিত্র্যময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে পরিতোষ সেন প্রবহমান সময়ের সঙ্গে যুক্ত রাখেন তাঁর শিল্পকে। আঙ্গিককেও তিনি মিলিয়ে নেন বিশ্লেষণাত্মক স্বাভাবিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যসম্পৃক্ত প্রবহমান পরম্পরার নানা ছায়া - প্রচ্ছায়া। চল্লিশের নন্দনচেতনাকে এভাবেই তিনি সাম্প্রতিক পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন সময়ের সারাৎসারকে আত্মস্থ করে। ভারতের চিত্রকলার আধুনিকতায় এটাই তাঁর স্মরণীয় অবদান।